দুর্ভিক্ষের গল্প, ক্ষুধার আখ্যান

# নগরখানা

সম্পাদনা
বেলাল চৌধুরী
মধুময় পাল

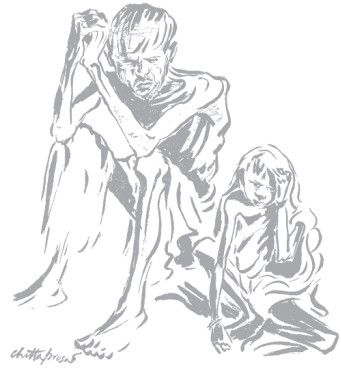

পুনশ্চ

## সূচি


| | | |
|---|---|---|
| চার পয়সায় এক আনা | জগদীশ গুপ্ত | ২১ |
| রাজধানীর রাস্তায় | শচীন সেনগুপ্ত | ৩১ |
| ভিড় | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪৬ |
| প্রেত | রমেশচন্দ্র সেন | ৫২ |
| শেষের হিসাব | পরিমল গোস্বামী | ৬৫ |
| লঙ্গরখানা | আবুল মনসুর আহমদ | ৬৮ |
| ইস্কাপন | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮২ |
| নিমন্ত্রণ | মনোজ বসু | ৯৬ |
| ক্ষুধার দেশের যাত্রী | সরোজ রায়চৌধুরী | ১০৫ |
| কালনাগ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ১১৪ |
| কন্ট্রোল | প্রভাবতী দেবী সরস্বতী | ১৩০ |
| অঙ্গার | প্রবোধকুমার সান্যাল | ১৩৪ |
| দুর্ভিক্ষ | মহীউদ্দিন চৌধুরী | ১৪০ |
| কে বাঁচায়, কে বাঁচে | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৪৯ |
| ১৯৪৩ | সোমনাথ লাহিড়ী | ১৫৪ |
| কতটুকু ক্ষতি | সুবোধ ঘোষ | ১৭৭ |
| খেলার প্রতিভা | কমলকুমার মজুমদার | ১৮৩ |
| খুনি | সুশীল জানা | ২০১ |
| লুলু | বিনয় ঘোষ | ২১১ |
| কল্কি | নবেন্দু ঘোষ | ২১৭ |
| নক্র-চরিত | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৩১ |
| ধানকানা | ননী ভৌমিক | ২৪৪ |
| নয়নচারা | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ | ২৫৩ |
| দুর্বোধ্য | সুকান্ত ভট্টাচার্য | ২৫৯ |
| মঙ্গাকাব্যের প্রণয়মঙ্গল | আবুবকর সিদ্দিক | ২৬২ |
| শুন হে লখিন্দর | শওকত আলী | ২৭৬ |
| সরল হিংসা | হাসান আজিজুল হক | ২৮৪ |
| অবিনাশী আয়োজন | মঞ্জু সরকার | ২৯১ |
| গরম ভাত আর নোয়াব আলীর মা | চন্দন আনোয়ার | ৩০৭ |
| কাঁকরের হিসাব | ধীরেন্দ্রলাল ধর | ৩১৭ |
| লেখক পরিচিতি | | ৩২৩ |

# চার পয়সায় এক আনা

## জগদীশ গুপ্ত

রোজ আনে রোজ খায়, এ কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে; কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয় এবং রোজ যাহা খায় তাহা পুরাপুরি নহে।

দুই ভাই—কাশী আর শশী। শশী ছোটো এবং খঞ্জ, সন্তানসংখ্যা তারই বেশি। কাশীর একটি কন্যা, দুটি পুত্র; শশীর দুটি পুত্র, দুটি কন্যা। এই একটি বেশির দরুণ শশীর আন্তরিক লজ্জা-কুণ্ঠা কিছু নাই; তার মনে মনে সে ষষ্ঠীর কৃপা আর চায় না। অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে ইহাদের, সংসার-সম্ভোগের আনন্দ আর পরিবেশোৎসব নষ্ট হইয়া গেছে। বউয়েরা তো আছেই—ভগিনীটি বিধবা হইয়া একটি পুত্রসহ ভাইয়েদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহারাও খায় এবং পরে—সুতরাং তাহাদের বাবদ খরচ আছে। এই দরিদ্র পরিবারের কর্তা কাশী; সংসার প্রতিপালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব তাহারই। প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া ওঠে—অনাহারে ফেলিয়া রাখিবার উহারা কেউই নহে।

একটি গোরা ইহাদের ছিল—বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী অবস্থায় ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিত কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড় কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে—গৃহপালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে—বঞ্চিত করিতে যতটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।

শাকপাতা কুড়াইয়া তাহাদের আংশিক উদরপূর্তি চলে, ইহা মিথ্যা নহে, বিস্ময়ের বিষয়ও নহে। দু-ভাইয়ের যা উপার্জন-ধন এবং ধান্য—তাহা সামান্য—পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য, প্রয়োজনের হিসাবেও সামান্য। অনন্ত পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ ধান্য তাহারা ঘরে তোলে তাহা অত্যন্ত কঠিন কৃপণের মতো বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াও বড়োজোর পাঁচ মাস চলে  একটি ধান দৈবাৎ উঠানে পড়িয়া থাকিলে সেই অপচয়ে কাশী আর শশী রাগিয়া আগুন হইয়া যায়; চোখ বাড়াইয়া গাল দেয়—লক্ষ্মীছাড়ার দল।

ধন উপার্জন করিতে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। বলিতে কী, খঞ্জ শশী দূরবর্তী পল্লি অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়তে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা—কাশী ছাড়া আর কেহ তা জানে না। কিন্তু এই চাল বিক্রয়ের ব্যাপারটা বড়োই লোকসানের। আড়তের কয়েল রজনী হাজরা হৃদয়হীন, অতি-হিসাবি চতুর



লোক—ন্যায্যভাবে ওজন করিয়া সঠিক মূল্যের পুরা প্রাপ্তির জন্যই শশীকে হাত জুড়িতে হয় অনেকবার—অন্নাভাবের অজুহাতে স্বয়ং রজনী কয়েলের এবং তার পরলোকগত বাপ-মায়ের দোহাই পাড়িয়া অনেক কাতরোক্তি তোষামোদ করিতে হয়—কিন্তু ফল হয় না; প্রবঞ্চক আর প্রভুভক্ত রজনী হাজরা যেন পণ করিয়া আছে, খঞ্জ ভিখারি শশীকে সে দামে ওজনে ঠকাইবেই।

যথোচিত প্রাপ্য না পাইয়া আর রজনীর নির্লজ্জতায় শশীর রক্ত বৃথাই উত্তপ্ত হইয়া উঠে—রজনীর তুমুল কর্মতৎপরতায়, অর্থাৎ চিৎকারে তার পাগল-পাগল ঠেকে।

লোক খাটাইবার লোক অনেক আছে, এবং লোক খাটাইবার লোক খুঁজিবার পথও অনেক আছে—তবু হঠাৎ এমন হয় যে, খাটিবার লোক খাটাইবার লোককে খুঁজিয়া পায় না। এমন বেকার অবস্থা মাঝে মাঝে আসে বলিয়া কাশীদের আয়-আমদানি তেমনভাবে একটানা আর প্রচুর নহে যাহাতে সম্পূর্ণ মিটিয়া মনে হয় দিন ভালোই যাইতেছে।

পাঁঠা কিনিয়া তাহার মাংসের ভাগ এবং চামড়া বিক্রয় দু-একবার করা হইয়াছিল, কিছু লাভ দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু তাদের এ ব্যাবসা শুভক্ষণে শুরু হয় নাই—বাধা পড়িল। তাহাদের বড়ো আদরের আর মমতার পাত্রী বিধবা ভগিনীটি এই নৃশংসতায় হঠাৎ একদিন আতঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠায় এবং প্রবোধ না-মানায় তাহারা লাভজনক জীবহত্যার পথটা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দিফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।

তাহাদের জীবনে ঘটনা নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য কী দিক পরিবর্তন নাই; কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটিল—তাহা বর নয়, অভয় নয়, অভিসম্পাত নয়, নির্জীব স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বুদ্‌বুদ যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ তাহা নহে।

কাশীর ছেলে বিশু বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—বয়স দশ হইবে; তার দু-ভায়ের ছেলে-মেয়ে জন্মিয়াছে একবার এর একবার ওর, যেন পালা করিয়া।

ছেলে-মেয়েরা দরিদ্রের সন্তান, তাহাদের খেলাধুলাও দরিদ্রোচিত—একটা কাঠির মাথায় খানিক ন্যাকড়া বাঁধিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই তাহাদের খেলা চমৎকার জমিয়া ওঠে। খানিক খানিক ধুলা হাতে করিয়া ছিটাইয়া ছিটাইয়া পরস্পরের গায়ে দিতে পারিলেই তাহাদের মনে হয়, এ খেলাও ভালোই। ধুলা যদি ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া অন্যদিকে যায় তবে তো আরও আনন্দ।

কাশীদের বাড়ির কঞ্চির ফটক খুলিয়া বাহির হইলেই একটু স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া যায়—স্থানটি দূর্বামণ্ডিত কিন্তু সব সংকীর্ণ। তার পরেই কাঁচা পা-পথ—মানুষ চলে; এবং পাড়ার ভিতর বহুসংখ্যক গোরু-বাছুর পথে মাঠে চরিতে যায় এবং চরিয়া ঘরে ফেরে।

সুতরাং তাহাদের খুরের আঘাতে আঘাতে শুকনো মাটি গুঁড়া হইয়া পথের ধুলা বিস্তর—দেড় আঙুল পুরু হইয়া ধুলা আগাগোড়া জমিয়া থাকে।

কাজেই কাশীর এবং শশীর ছেলে-মেয়েদের সুলভে খেলার বেশ সুবিধা আছে। তাহারা পথের ধুলার উপরেই খেলিতে বসিয়া যায়—ধুলা জড়ো করে, ধুলা উড়ায়, অঞ্জলি ভরিয়া ধুলা তুলিয়া আঙুলের ফাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয়—নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হাতের ধুলা মাটিতে পড়িতে থাকে। এক-একবার ধুলা জড়ো করিয়া তার ওপর হাত চাপড়াইয়া শক্ত করে; তারপর আঙুল ঢুকাইয়া ধুলার ঢিপির গায়ে করে অসংখ্য ছিদ্র, চারিদিকে ধুলার বাঁধ দিয়া একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়, আর সবাই মিলিয়া সেখানে করতলের ছাপ বসায়, বাঁধের ধুলায় বটের পাতা গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেয়, এবং নিজেরাই সেই কৃতিত্ব আর শোভা অবাক হইয়া দেখে; পথিকের ধমক খায়; গোরুর পাল আসিতে থাকিলে পলায়ন করে...

কিন্তু একদিন বড়ো লাভ হইয়া গেল।

কাশীর ছেলে এবং মেয়ে, যথাক্রমে বিশু ও নারানি যথারীতি পথের ধুলায় উপস্থিত; শশীর ছেলে এবং মেয়েরা যথাক্রমে রসো এবং দাসী ও হাসিও আসিয়াছে।

আজ খেলা হইতেছে ধুলা ছাঁকার।

হাসি পথের ওপর আড় হইয়া পড়িয়া খেলায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল; অধিনায়ক বিশু তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টানিয়া লইয়া তফাতে দূর্বার ওপর বসাইয়া দিয়াছে; সেখানে বসিয়া সে অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া থামিয়া আর টানিয়া টানিয়া কাঁদিতেছে।

উহাদের খেলা এমন নির্বিঘ্নে চলিতেছে। ধুলা আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া দুই করতলের সংযোগস্থলটি একটুখানি ফাঁক করিয়া ধুলা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—ধুলা সমস্তটা মাটিতে পড়িয়া সকলের পরে নিঃশেষ কাহার হয় প্রতিযোগিতা চলিতেছে তারই...

বিশুই দুবার জিতিয়েছে, প্রধান বলিয়া কতকটা গায়ের জোরেই।

শশীর পুত্র রসো বলিল, এখানকার ধুলা ভালো নয় ভাই। বলিয়া সে খানিক সরিয়া বসিল। এবার সে যেন একটু নির্লিপ্ত—পাল্লা দিবার উৎসাহ তেমন নাই। আপন মনেই ধুলা ছাঁকিতে ছাঁকিতে তৃতীয়বার ধুলা ঝাড়িয়া ফুরাইবার পরই সে হঠাৎ ডান হাতটা মুঠা বাঁধিয়া ঝাঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—বাড়ির ভিতর গেল না, গেল অন্যদিকে।

কীরে?—বলিয়া বিশু যখন লাফাইয়া উঠিল, তখন রসো বহু দূরে চলিয়া গেছে, কিংবা কাছেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে আর দেখা গেল না।

সূর্যাস্তের তখন বেশি বিলম্ব নাই। ছোটো বোন দুটিকে বাড়ির ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বিশু রসোর সন্ধানে গেল; কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইল ঢের  সাত-আটটা বাড়ির চারিদিকে এবং অভ্যন্তর—কিন্তু বৃথা; রসো কাহারো বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। পাড়ারই মথুর এবং তোষিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল; তাহারা বলিল যে, রসোকে তাহারা দেখে নাই।



বিশু বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া 'রসো' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—রসোর সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু রসো তো আকাশে উড়িয়া যায় নাই, ডোবার জলে ডুবিয়াও লুকাইয়া নাই। এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ বিশুর নজরে পড়ল সন্ধ্যামণি বোষ্টমির বাড়ির লাগাও তাল গাছটার আড়ালে কে যেন রহিয়াছে—একখানা কালো হাত দেখা যাইতেছে...

বিশু পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাল গাছের নিকটবর্তী হইয়াই সে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভীতিপ্রদ শব্দ করিয়া রসোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল—যেন দৈত্য রসোকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সেই শব্দে এবং আবির্ভাবে রসো চমকিয়া উঠিয়াই ডান হাতটা তাড়াতাড়ি পিছন থেকে লইল যেন পিছনদিকে হাত লইলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে—সে হাত সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিবার সাধ্য বা বুদ্ধি কাহারো নাই!

বিশু বলিল, দেখি তোর হাতে কী।

বিশুর পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল, কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার ঘটে।

রসো বলিল, কিছু না। ঘাঁটিয়ো না বলছি।

বিশু বলিল, বাড়ি আয়। বাবা তোকে ডাকছে।

আমি এখন যাব না।

তবে দেখা, তোর হাতে কী রয়েছে।

তোর মাথা...

মার খাবি বলছি। বলিয়া বিশু তার লুকানো হাতের দিকে অর্থাৎ পিছনদিকে যাইতেই রসো ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবং তারপর ক্রমাগত সেই ডান হাতখানাকে সম্মুখে আনা আর পশ্চাতে লওয়ার আবর্তন শুরু হইয়া গেল। কিন্তু বিশুর বুদ্ধি তখন সজাগ বেশি। সে একবার কায়দা করিয়া রসোর ডান হাতের ওপর ডানা চাপিয়া ধরিতেই তাহা শরীরের ওপর আক্রমণে দাঁড়াইয়া গেল; রসো শরীর মুচড়াইয়া-দুমড়াইয়া এমন করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, সন্ধ্যামণি বোষ্টমি, মথুর গাড়োয়ান, বিরিঞ্চি গরাই প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যক্তিগণ তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিল, ব্যাপারটা কী! সন্ধ্যার পূর্বেও ঘরে না যাইয়া ওরা করিতেছে কী।

কিন্তু মানুষগুলি কাহারো সুহৃদ নহে—তাহারা সান্ত্বনা দিতে জানে না, বিচারের ধার ধারে না, কেবল 'কে রে?' বলিয়া হুংকার ছাড়িয়া ছেলেমানুষের পেটের প্লীহা চমকাইয়া দিতে পারে। তাহারা করিলও তা-ই—বিবদমান ছেলে দুটিকে তাহারা ধমকাইয়া কাবু করিয়া দিল এবং অভাবনীয় প্রহারের ভয় দেখাইয়া অবস্থা এমন গুরুতর করিয়া তুলিল যে, নিজের কর্তৃত্ব তুলিয়া অভিভাবকগণের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া ছাড়া বিশুর গত্যন্তর রহিল না।

রসোর হাত ধরিয়া বিশু অভিভাবকগণের উদ্দেশেই যাত্রা করিল—চলিতে চলিতে পথের মাত্র একটি কথা হইল—বিশু বলিল, বল-না ভাই, তোর হাতে কী?

বিশুর প্রশ্ন রসো গ্রাহ্যই করিল না।

রসো ক্রোধভরে ঘাড় গুঁজিয়া এবং দুঃখভরে কান্নার একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে করিতে দাদা বিশুর আকর্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করিল। এখানে তার অভিভাবক ঢের, এবং তাদের শক্তিও ঢের—রসোর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল... এখানে আত্মসমর্পণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

শশী দাওয়ায় বসিয়া এবং ঠেস দিয়া হুঁকা টানিতেছিল  বাতাসের তখন গতি ছিল না—কাজেই মুহুর্মুহু আকর্ষণে ধূম নির্গত হইয়া শশীর সামনেই জড়ো হইয়াছিল, আর শশী মনে মনে গাল দিতেছিল কয়েল রজনী হাজরাকে—আজও রজনী পৌনে দু-সের চালকে ওজনে এক সের ন-ছটাক দাঁড় করাইয়া নিজের হিসাব অনুসারে দাম দিয়াছে—তার আকুল প্রতিবাদ ফলপ্রদ হয় নাই।

আসামি রসোকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বিশু বলিল, কাকা রসো কী যেন পেয়েছে ধুলার ভিতর—কিছুতেই দেখাবে না! দেখো, ওর মুঠোর ভেতর রয়েছে...

এই সংবাদে শশী ফুৎকার দিয়া সম্মুখের ধোঁয়া দিগ্‌বিদিক উড়াইয়া দিল—তারপর বলিল, তোর হাতে কী দেখা। রসো সেই যে মুষ্টি বাঁধিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও আর খোলে না—হাত ঘামিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে, আঙুলে দারুণ যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে, তবু খোলে নাই।

বলিল, না আমি দেখাব না। এ আমার।

শশী অভয় দিল—তোরই থাকবে—দেখা।

কিন্তু, আর কারো নয়, পিতৃদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াও রসোর ভরসা হইল না—মুষ্টি খুলিয়া সে দেখাইল না।

তখন শশী ছেলের অবাধ্যতায়, আর তার দুঃসাহস দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেল; হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া আসিল—রসোর একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইল, অর্থাৎ রসোকে সম্মুখে করিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল; ভয়ংকর ভ্রূভঙ্গিপূর্বক গর্জন করিয়া বলিল, দেখা, দেখাবিনে? তবে দেখ মজা। বলিয়া রসোর যে হাতে সেই সামগ্রী রহিয়াছে সেই ডান হাতখানা ধরিয়া শশী মুচড়াইয়া দিল।

তাহাতেও রসোর মুষ্টি খুলিল না।

তখন শশী তাহার মুষ্টিটাই তুলিয়া লইয়া তাহার ওপর ঠক ঠক করিয়া দুবার গাঁট্টা মারিল; এইবার ফল দর্শিল—ক্ষুদ্র রসোর শক্তিতে এবং জিদে আর কুলাইল না—মুষ্টি খুলিয়া হাতের সামগ্রী ছাড়া পাইয়া মাটিতে পড়িল এবং ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াইয়া পড়িল মাটিতেই। তখন স্পষ্ট দেখা গেল জিনিসটা কী! রসো প্রাণপণ করিয়া



আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহাকে ত্যাগ করা নয়, রসো প্রাণপণ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহাকে ত্যাগ করা নয়, খালি দেখাইতেই রাজি হয় নাই, সে জিনিসটা কী তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেল—শশীও দেখিল, বিশুও দেখিল, তাহা সোনা নয়, রুপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি...

কারখানার নতুন আনি—একটুও ময়লা হয় নাই; জাল জিনিস নয়; ক্ষয় হয় নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিস—অত্যন্ত নগদ জিনিস মূল্য চার পয়সা; ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এত যে, তার হিসাব করিতে বসাই ভুল।

মাটিতে সেই মহামূল্য জিনিসটি পড়িয়া থাকিবার অবসর পাইল মাত্র দুইটি মুহূর্ত—তার বেশি নয়; কিন্তু সেই দুই মুহূর্তের মধ্যেই ভাবের যে বন্যাটি বহিয়া গেল তাহা অত্যন্ত তীব্র...

সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল—কাশীর স্ত্রী কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি—সবাই; কী করিয়া যে দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিল তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য! সবারই ইচ্ছা হইল যে, আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয়—একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের—অন্যের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য হইবে, কিংবা অন্যের দাবি করিতে ভুলিয়া যাইবে, কিংবা দাবি করিতে সাহসই পাইবে না; আজ সবাইকার নাগালের বাহিরে যাইয়া চিরকালের জন্য তাহা আপনার হইবে...

প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিল—হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিল...

কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইল তা-ই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইল তা-ই, ভগিনী কুমারীর হইল তা-ই; বিশু প্রভৃতির কী হইল তাহা বলাই যায় না। লোভ হইল না কেবল রসোর—সে তখন মৃত্তিকায় শায়িত এবং শোকে অভিভূত।

কিন্তু ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করল শশী; তৃতীয় মুহূর্তেই আনিটা নির্বিবাদে কুড়াইয়া লইয়া সে খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে যাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিল; আনিটা রহিল তার হাতের ভিতর—তাহার পর সে নির্বিকারের মতো হুঁকা টানিতে লাগিল। বলা বাহুল্য মনঃক্ষুণ্ণ হইল সবাই।

কিন্তু যে জিনিস কাহারো নয়, কাহারো পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে যাহা আসে নাই, তাহার ওপর দাবি করিয়া শশীর এই হস্তার্পণে প্রতিবাদ কেহ করিল না; কাঞ্চন আর মোক্ষদা সরিয়া গেল—

কুমারী বলিল, দাদা, পড়ে-পাওয়া পয়সার হরির লুঠ দিতে হয়।

শশী বলিল, তুই হলে দিতিস?

কুমারী সে কথার জবাব দিল না; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে অপ্রতিভ হইয়াছে।

শশী পুনরায় বলিল, হরির লুঠের নাম আর করিসনে। আমরাই কোন হরির লুঠের তার ঠিক নাই।

কুমারী এবার হাসিল; বলিল, ও কথা বলতে নেই। হরি আবার দশটা-বিশটা আছে নাকি?

শশী কথা কহিল না। এই আনিটা কী প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল—চাল-ডালের প্রয়োজনে নহে—নিত্যব্যবহার্য এবং স্থায়ী একটি জিনিস ক্রয় করিয়া তাহার মারফত প্রচুর আনন্দ পাইতে হইবে এবং এই প্রাপ্তির সৌভাগ্যটা যাহাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাই অর্থাৎ একটি হুঁকা। কিন্তু সে ইচ্ছা সার্থক হইবার পক্ষে বিঘ্ন ইহাই যে, একটা আনি যত মূল্যবানই হোক, তাহাতে পছন্দসই হুঁকা একটি হয় না।

বড়ো বউয়ের পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভ আছে; সে ওদিক হইতে বলিল, বামুনকে দাও, পুণ্যি হবে।

শশী বলিল, আর বামুন ডাকিতে হবে না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাদের তো বেরুতে হয় না—পয়সার কষ্ট তোমরা বুঝবে কী। কেউ বলছেন হরির লুঠ দাও, কেউ বলছেন বামুনকে দাও, পুণ্যি করো—যেন আমাদের আর-কিছু দিয়ে দরকারই নাই। আমি বলছি, এ তোলা থাক; সবারই পারের কড়ি এতে হবে।

তামাক সেবনের বিলাস থাকা সত্ত্বেও শশী নিজের জীবন দুর্বহ মনে করে—সে বৈতরণীর দিকে তাকাইয়া আছে।

ছোটোবউ বলিল, তোলা থাকবে কেন? মুড়ি-বাতাসা আনা হোক, ছেলেরা ফুর্তি করে খাক। ওরাই তো পেয়েছে আনিটা। ওতে আর-কারো দাবি নাই।

শুনিয়া রসো মাটির ওপর পাশ ফিরিল।

শশী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, উনি এলেন দাবি দেখাতে। আরে, দাবিই যদি আজকাল দেখানো যেত, তবে রজনী হাজরার কাছে আমার ঢের পাওনা হয়।

কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, সে কে?

শশী বলিতে লাগিল, কই, তখন তো হরির লুঠের হরিও আসেন না, পুন্যির জাহাজ বামুনও আসেন না বিচার করতে। আমাকে সে ফাঁকিই দেয়!—তারপর রাগের মাথায় শশী বলিয়াই ফেলিল, এ পয়সা আমারই হল। আর একটা আনি পেলেই হুঁকা কিনব।

এটা শশীর অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে করিয়া কুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তবে যে বলেছিলে, পারের কড়ি হবে?

শশী বলিল, হুঁকোও খানিক দূর সঙ্গে যায়।

শশীর মনের আদত ইচ্ছা হুঁকা কেনাই, কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা যেমন তাহাতে একটা হুঁকা থাকিতেই আর-একটি হুঁকা কিনিয়া নিদারুণ অপব্যয় করিবে এরূপ প্রস্তাব



করা ভালো হয় নাই—ইহা মনে করিয়া শশী একটু ছলনা করিল; বলিল, হুঁকোর কথা আমি মিছে করে বলেছি। দাদা আসুক, সে কী বলে শুনো তবে ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিয়া এখনই করা হইতেছে না দেখিয়া ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিতে বিশু অগ্রসর হইয়া গেল; বলিল, আমাকে দাও কাকা...

তাহলেও গোল মেটে—না? কী করবি তুই?

কাজ আছে।—যেন কাজটা এমনই ব্যাপক আর গুরুত্বপূর্ণ যে, বিস্তৃত করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়।

কিন্তু শশী তার কথার মর্ম বুঝিল না; করিল বিদ্রুপ; বলিল, উঃ! কী কাজের লোক রে!

বুঝি পাইয়া যায়! অত্যন্ত আতঙ্কিত আর ব্যগ্র হইয়া আর আর ছেলে-মেয়েরা সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে দৌড়াইয়া আসিল—প্রাণপণে চিৎকার করিয়া আর হাত পাতিয়া বলিতে লাগিল, ওকে দিয়ো না, আমায় দাও।

শশী তাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে চিৎকার করিতেছে, কুমারী তারস্বরে হাসিতেছে, এবং সর্বসমেত গোলমাল যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন প্রবেশ করিল কাশী।—কাশী অপর কোনো কাজ না পাইয়া রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ লইয়াছে।—সুরকি মাখাইতে হয়, ইট টানিতে হয়—মালমশলা সাজসরঞ্জাম মিস্ত্রির হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

সে যাহাই হউক, সেখানে এত কলরব নাই। কাশীকে দেখিয়াই এখানকার কলরব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার আদ্যোপান্ত কাশীর জানা হইয়া গেল। সবাই মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে রসো খেলিতে খেলিতে রাস্তার ধুলার ভিতর একটা আনি পাইয়া গেছে; আনিটাকে রসোর হস্তচ্যুত করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; তাহা এখন শশীর জিম্মায় রহিয়াছে; কীভাবে তাহাকে ব্যবহারে লাগানো যায় তাহাই বর্তমানে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া আছে—বিভিন্ন ব্যক্তির মতে বিভিন্ন উপায়ে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছে—হরির লুঠ, ব্রাহ্মণকে দান, মুড়িভক্ষণ ইত্যাদি।

বড়োবউ কাঞ্চন সবাইকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিল—তাহার মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা সে দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল, বলিল যে, পয়সা সচল পদার্থ; যাইতেই সে আসে; কিন্তু যাইবার সময় সে যদি মানুষের দেহে কিছু পুণ্য রাখিয়া যায় তার তাহাই ভবিষ্যতে কাজে লাগে—আর কিছু নয়।

স্ত্রী-র মুখে এই পুণ্যপিপাসু কথা শুনিয়া কাশী চটিয়া গেল এবং দেখা গেল, শশীর সঙ্গে ও বিষয়ে তাহার মতের মিল আছে। বলিল, বাহাদুরি রাখো। শশী, তুই রেখেছিস তো আনিটা? রাখ তুলে।